অন্ধকারের উৎস হতে

বিশ্বযুদ্ধকালীন প্রাগ শহরে ইহুদি নিধন পর্বের মাঝে একটুকরো প্রেম। লিখছেন ইন্দ্রনীল শুক্লা

এক্কেবারে ভুলে যেতে চাই... কিছুতেই মনে রাখতে চাই না... এমন কথাগুলো আমরা যা যা কিছু সম্পর্কে বলি, সেই সবকিছু সত্যিই ভুলে যেতে পারি কি? বোধহয় না। আর পারি না বলেই বার বার নিজেকে ঠকাতে ঘোষণা করতে থাকি বিস্মৃতির অঙ্গীকার। আদপে হয় না তা। কারণ, ভয় এবং অত্যাচারের স্মৃতি কোনও ভাবেই বিদায় নিতে চায় না আমাদের মন থেকে। এক চিরস্থায়ী ছাপ ফেলে যায়। কোনও দিনই কি ভুলতে পারবো বিমানের ঘায়ে টুইন টাওয়ার ভেঙে পড়ার দৃশ্য? একবার দেখে থাকলে মাথা থেকে কোনও দিনই যাবে না সাংবাদিক ড্যানিয়েল পার্লের মাথা কেটে নেওয়ার ভিডিও? ভোলা যায় এই কিছুদিন আগে দেখা সমুদ্রসৈকতে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকা মৃত শিশুর ছবি? তাই যতই বলি না কেন পালিয়ে যেতে চাই, স্মৃতি ধাওয়া করে যেতেই থাকে। আর সেই ট্রমা, আতঙ্ক দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে যে রকম সাফল্যের সঙ্গে ছড়িয়ে দিতে পেরেছিল হিটলারের নাৎসি বাহিনী, তারও বুঝি কোনও তুলনা নেই। সেই ভয়ানক, স্নায়ু চিনচিন করা সময়টাই ধরা পড়েছে বছর কুড়ি পরে গোষ্ঠী প্রযোজিত 'এবং অন্ধকার' নাটকে।

এ নাটকের সময়কাল ১৯৪২ সাল। ঘটনাস্থল চেকস্লোভাকিয়ার প্রাগ শহরের একটি ছোট বাড়ি। এ শহরের মগজে তখন কার্ফু। রাজপথে, গলিতে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে শক্ত চোয়ালের নাৎসি সেনা অফিসাররা। মৃত্যু সেখানে স্বাভাবিক ঘটনা। বেঁচে থাকাটাই বিস্ময়ের। অন্ধকারে রাতে পথ হাঁটতে গেলে পা পিছলে যেতে পারে রক্তে! কারণ, ইহুদিদের মেরে ফেলতে কোনও অনুমতির প্রয়োজন নেই। পছন্দ না হলেই গুলি চালানো যেতে পারে। ইহুদি বলে চিনে নিতে কোনও অসুবিধাও নেই। কারণ, ফরমান জারি করে হলুদ-ব্যাজ ঝুলিয়েই রাখা হয়েছে তাদের গলায়।

এই যখন পরিস্থিতি, তখনই প্রাগ শহরের এক কলেজছাত্র পলের (**কিঞ্জল নন্দ**) সঙ্গে দেখা হয়ে যায় পালিয়ে পালিয়ে বেড়ানো ইহুদি মেয়ে এস্তারের (**বিন্দিয়া ঘোষ**)। বাবার (বিশ্বরূপ পুরকায়স্থ) টেলারিংয়ের দোকানের পিছনে একটা ঘুপচি ঘরে সে লুকিয়ে রাখে মেয়েটিকে। মাকেও (এণাক্ষী সেন) জানায় না সে কথা। মাকে লুকিয়ে মেয়েটিকে খাবার এনে দেয়। গল্পের বই এনে দেয়। গান শোনায়। মেয়েটি জানায় সে নৃত্যশিল্পী হতে চায়। আবার ছেলেটি জানায় তার জ্যোতির্বিজ্ঞান গবেষণার ইচ্ছার কথা। জাত-পাত-ইহুদি-আরিয়ান এইসব দ্বন্দ্ব কোথায় হারিয়ে যায়!

ইতিমধ্যেই বিপ্লবী হামলায় এক নাৎসি অফিসার খুনের প্রতিশোধে নয়া হত্যা ফরমান জারি হয়। তাতে কোনও ইহুদিকে আশ্রয় দেওয়ার জন্য মৃত্যুর সাজা ঘোষণা হয়। কিন্তু ততদিনে যে ছেলেটি আর মেয়েটি পরস্পরকে ভালোবেসে ফেলেছে। 'লাভ ইন দ্য টাইম অফ কলেরা'!

ছেলেটির বাবার দোকানে নানা রকম মানুষ আসেন। রাগে ফুঁসতে থাকা কাপড় ব্যবসায়ী চিপেক (শ্যামল চক্রবর্তী) যেমন আসেন, তেমনই আসেন নাৎসিদের চর হিসেবে কাজ করতে থাকা রেঝসেক (প্রবীর দত্ত)। দু'জনের বাকবিতন্ডা যে মাঝেমধ্যেই লেগে যায় তা তো স্বাভাবিক। আর আসেন এই বাড়িতেই ভাড়াটে হিসেবে থাকা চিত্রশিল্পী জাভো (সুরজিৎ সেনগুপ্ত)। যুদ্ধে যৌবনের, সভ্যতার অপচয় তাঁকে ব্যাকুল করে। আর মাঝে মাঝে এসএস বাহিনীর ভয়াবহ জল্লাদসম অফিসারদের (সুদীপ মুখোপাধ্যায়, সৌরভ ঘোষ) মুখ দেখাটাও দুঃস্বপ্নের মতো। এই অন্ধকার সময়ে বেঁচে থাকতে পারলো কি পল-এস্তারের প্রেম? জয় হল কি মনুষ্যত্বের? সেটা প্রেক্ষাগৃহে দেখাই ভালো।

প্রায় প্রত্যেকেই চমৎকার অভিনয় করেছেন। গোটা উপস্থাপনাটি ভারি মুন্সিয়ানার সঙ্গে সামলেছেন পরিচালক পৃথুনন্দন ঘোষ। আলাদা করে প্রশংসা প্রাপ্য তাঁর। তবে নাটকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র ছিল ভয়। তাতে কোনও সন্দেহ নেই। আর তার জন্য প্রয়োজন ছিল যে রকম আধো অন্ধকার আলো তা ফিরে ফিরে এসেছে। মঞ্চসজ্জা এবং কস্টিউম আমাদের সেই সময়টাতে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পেরেছে সফলভাবে। গানের ব্যবহারও করা হয়েছে বেশ পরিশীলিতভাবে। পিছনে বেজে উঠেছে পিয়ানো। কথক এসে আমাদের গান শুনিয়েছেন গল্প বলার ঢঙে। আবার একই রকমভাবে গান গেয়েছেন চরিত্রেরাও। জন লেননের 'ইমাজিন' গানটির ভাবানুবাদ করে অন্যরকম সুরে প্রয়োগ করা হয়েছে। মৃত্যুর নিসর্গের মধ্যেও হারায়নি বেঁচে থাকার কল্পনা!